৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ১৪

টপিক:

সারাংশ/সারমর্ম, ভাব-সম্প্রসারণ ও রচনা-২:

সারাংশ/সারমর্ম (গদ্য ও পদ্য), ভাব-সম্প্রসারণ।

রচনা (ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, রাজনৈতিক বিষয়াবলি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিয়ষক)

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

সারাংশ/সারমর্ম

➤ আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাওয়ার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি এই মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে 'মনুষ্যত্ব' কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই; এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়। উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজে পেলে আমাদের আত্মবিনাশের সম্ভাবনা যে অনিবার্য, তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

[৩৮তম বিসিএস]

সারাংশ/সারমর্ম

➢ ধর্মের মতো মতবাদও মনের জগতে লেফট-রাইট করতে শেখায়। ধার্মিকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ভয় আর পুরস্কারের লোভ। সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনে ও-সবের বালাই নেই। তারা সব কিছু করে ভালোবাসার তাগিদে। সত্যকে ভালোবাসা, সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, ভালোবাসাকে ভালোবাসা-বিনা লাভের আশায় ভালোবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসা-এরই নাম সংস্কৃতি। তাই ধার্মিকের পুরস্কারটি যেখানে বহু দূরে থাকে, সংস্কৃতিবান মানুষ সেখানে তার পুরস্কারটি পায় হাতে হাতে, কেননা, কাজটি তার ভালোবাসার অভিব্যক্তি বলে তার আনন্দ, আর আনন্দই তার পুরস্কার। সে তার নিজের স্বর্গটি নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। বাইরের স্বর্গের জন্য তাকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হয় না। [৩৭তম বিসিএস]

সারাংশ/সারমর্ম

- সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার- এ সবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। [৩৬তম বিসিএস]

সারাংশ/সারমর্ম

➤ প্রতিদিনের এই যে অভ্যস্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অভ্যস্ত প্রভাত আমার কাছে ম্লান। কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালোবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতা দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অরূপকে দেখতে পায়; তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ঐ অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমাবদ্ধ হয়েছিল।

[৩৫তম বিসিএস]

সারাংশ/সারমর্ম

- মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। নিয়ত মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না। দুর্বল, অসহায় পক্ষীশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বুঝে না-অলসকে সে প্রাণপাত করিয়া সেবা করে-ভীরুতার দুর্দশা কল্পনা করিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে ভীরুকে রক্ষা করিতে ব্যর্থ হয়।

সারাংশ/সারমর্ম

➢ কবিতার শব্দ কবির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির প্রতীক। বাক্যের মধ্যে অথবা পদবন্ধের মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দ আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। যারা কবিতা লিখবেন, তাদের মনে রাখতে হবে যে, অনুভূতিদীপ্ত শব্দসম্ভার আয়ত্তে না থাকলে, প্রত্যেকটি শব্দের ঐতিহ্য সম্পর্কে বোধ স্পষ্ট না হলে, কবিতা নিছক বাকচাতুর্য হয়ে দাঁড়াবে মাত্র। কবিতাকে জীবনের সমালোচনাই বলি বা অন্তরালের সৌন্দর্যকে জাগ্রত করবার উপাদানই বলি, কবিতা সর্বক্ষেত্রেই শব্দের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই শব্দকে আমাদের চিনতে হবে।

সারাংশ/সারমর্ম

নিষ্ঠুর ও কঠিন মুখ শয়তানের। কখনো নিষ্ঠুর বাক্যে প্রেম ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হয় না। কঠিন ব্যবহারে ও রূঢ়তায় মানবাত্মার অধঃপতন হয়। সাফল্য কিছু লাভ হইলেও যে আত্মা দরিদ্র হইতে থাকে, সুযোগ পাইলেই সে আপন পশু স্বভাবের পরিচয় দেয়। যে পরিবারের কর্তা ছোটদের সঙ্গে অতিশয় কদর্য ব্যবহার করে, সে পরিবারের প্রত্যেকের স্বভাব অতিশয় মন্দ হইতে থাকে। শিশুর প্রতি একটি নিষ্ঠুর কথা, এক একটা মায়াহীন ব্যবহার, তাহার মনুষ্যত্ব অনেকখানি কমাইতে থাকে। অতএব, শিশুকে নিষ্ঠুর কথা বলিয়া তাহার সঙ্গে প্রেমহীন ব্যবহার করিয়া তাহার সর্বনাশ করিও না। একটা মধুর ব্যবহার অনেকখানি রক্তের মতো শিশুর মনুষ্যত্বকে সঞ্জীবিত করে। পরিবারের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। ইহাই পরিবারের প্রতি প্রেম।

সারাংশ/সারমর্ম

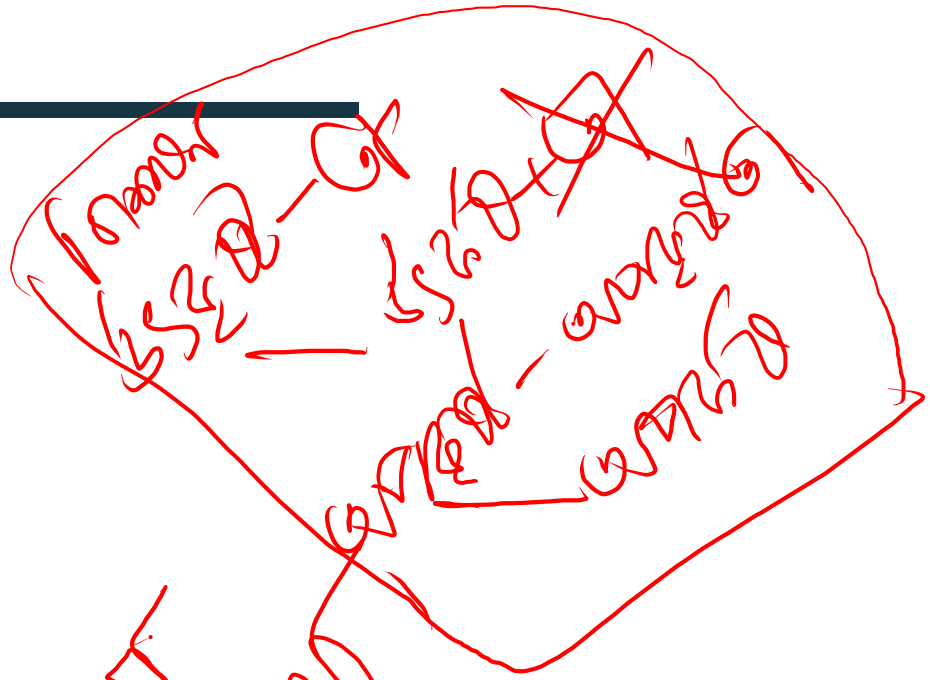

- ‘বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা’
  বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর;
  বুঝিলাম সে তো কবি নয়- সে যে আরূঢ় ভণিতা
  পাণ্ডুলিপি, ভাষ্যটীকা, কালি আর কলমের ’পর
  ব’সে আছে সিংহাসনে-কবি নয়-অজর, অক্ষর
  অধ্যাপক; দাঁত নেই- চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;
  বেতন হাজার টাকা মাসে-আর হাজার দেড়েক
  পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;
  যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
  চেয়েছিলো-হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

[৩৭তম বিসিএস]

হে চির-দীপ্ত, সুপ্তি ভাঙাও
জাগার গানে।
তোমার শিখাটি উঠুক জ্বলিয়া
সবার প্রাণে।
ছায়া ফেলিয়াছে প্রলয়ের নিশা,
আঁধারে ধরণী হারায়েছে দিশা,
তুমি দাও বুকে অমৃতের তৃষা
আলোর ধ্যানে।

[৩৬তম, ৩৪তম বিসিএস]

সারাংশ/সারমর্ম

- আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
  চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
  আমি চোখ মেললুম আকাশে
  জ্বলে উঠল আলো
  পুবে পশ্চিমে।
  গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'-
  সুন্দর হল সে।

[৩৫তম বিসিএস]

সারাংশ/সারমর্ম

নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে,
নিন্দুক সে তো ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে, পবিত্রতা আনে,
সাধকজনে নিস্তারিতে তার মত কে জানে?

[৩৪তম বিসিএস]

সারাংশ/সারমর্ম

➢ অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার
আলোড়ন নেই, পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

[১৭তম, ১১তম বিসিএস]

সারাংশ/সারমর্ম

➢ আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবী মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন, –
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

[১৫তম বিসিএস]

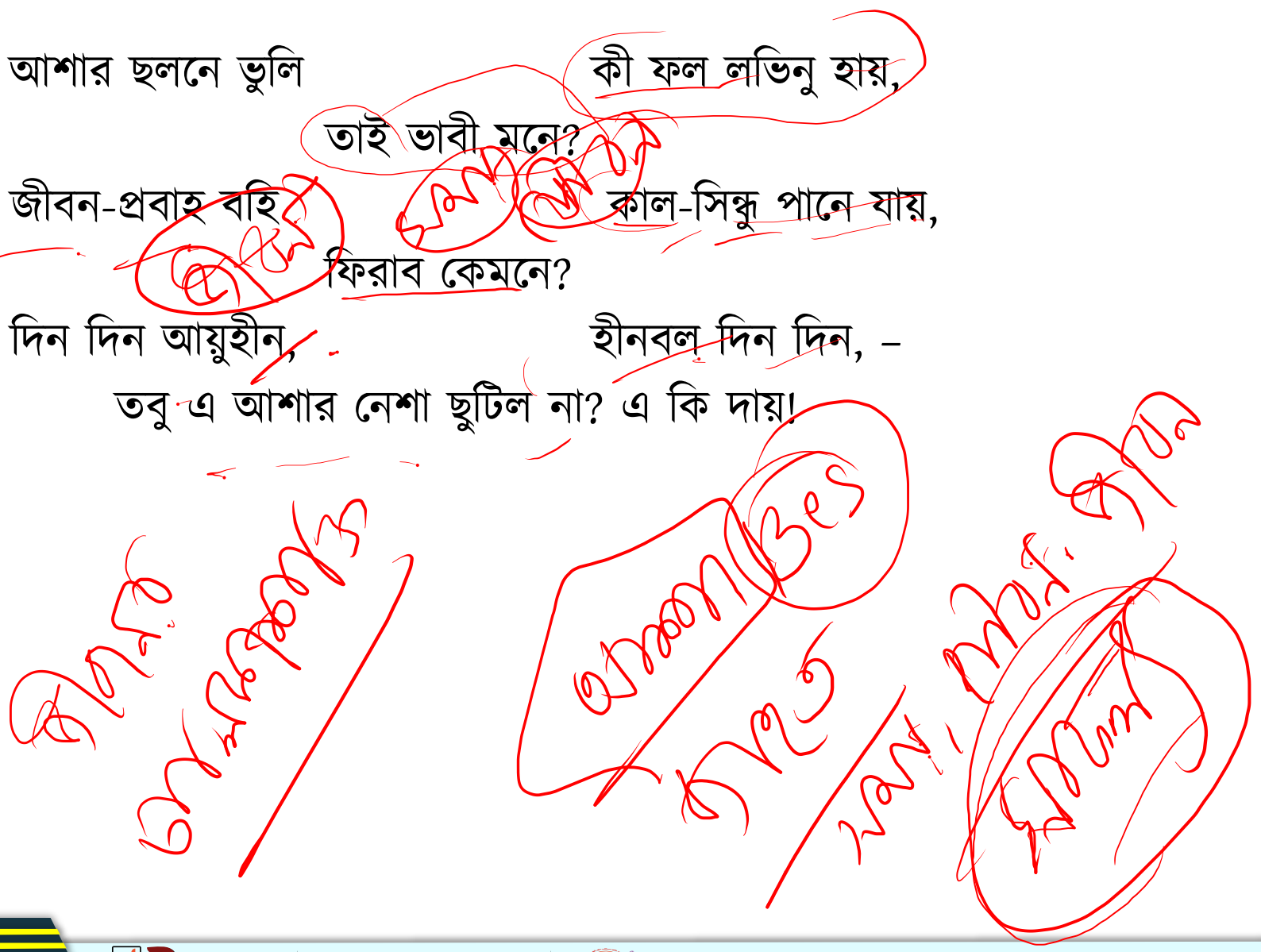

সারাংশ/সারমর্ম

➢ আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরিছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীত হারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে-
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কী তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভাল?

[১৩তম বিসিএস]

ভাব-সম্প্রসারণ

- কালচার সমাজতান্ত্রিক নয়, ব্যক্তিতান্ত্রিক। [৩৭তম বিসিএস]
- শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,

  লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির। [৪০তম বিসিএস]
- কমল হীরের পাথরটাকে বলে বিদ্যে,

  আর তা' থেকে যে আলো ঠিকরে বেরোয়, তার নাম কালচার [৪০তম বিসিএস]
- কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না [২৮তম বিসিএস]
- পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না [২৭তম ও ২৩তম বিসিএস]
- সংস্কৃতি শব্দটি উচ্চারণ করা সহজ, বোঝা কঠিন এবং বোঝানো কঠিনতর। [২৫তম বিসিএস]
- স্বাধীনতা অর্জন করার চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন [২৫তম বিসিএস]

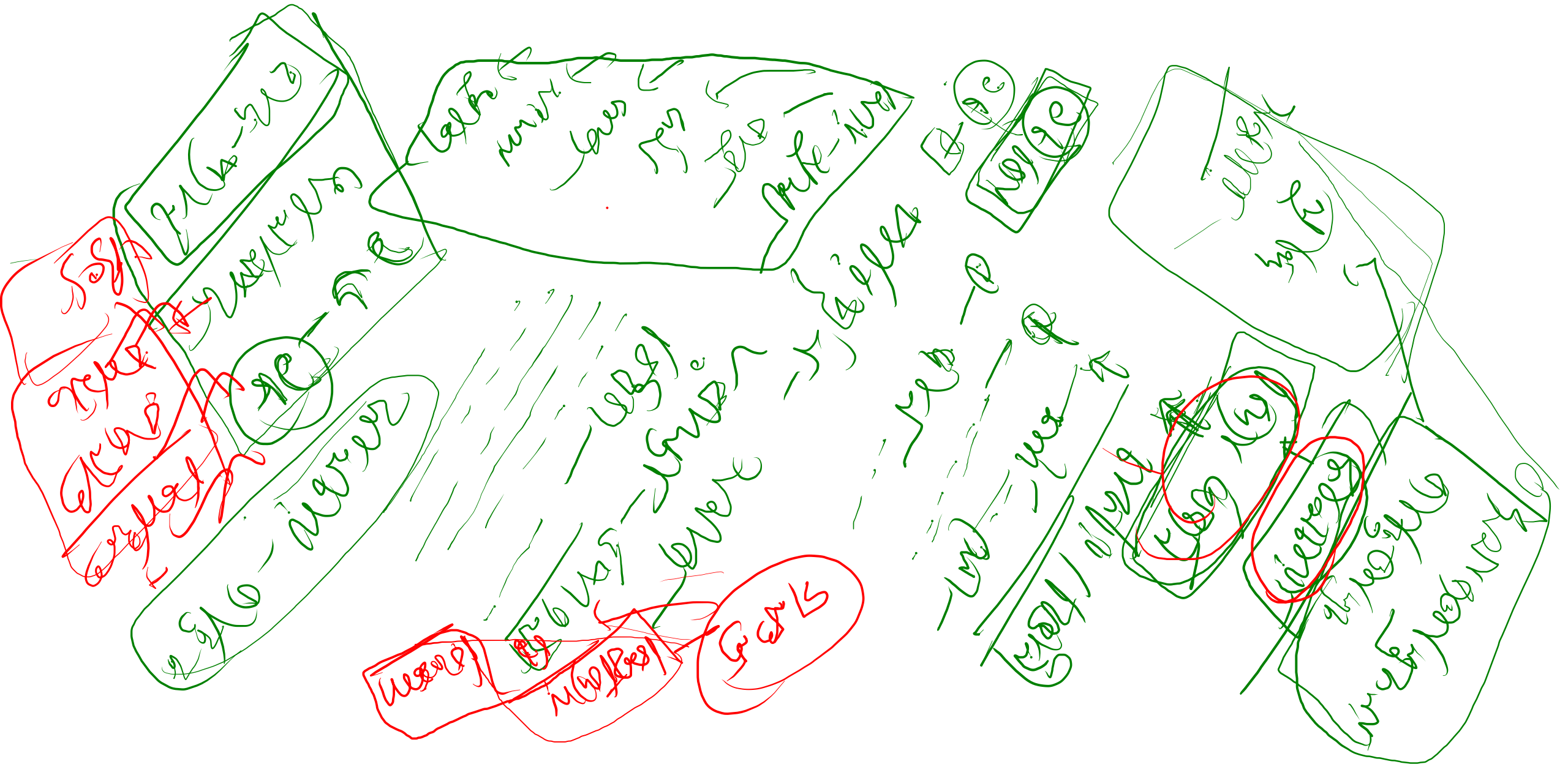

ভাব-সম্প্রসারণ

- বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না [২৫তম বিসিএস]
- সাহিত্য, শিল্প, সংগীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়-উপায়। [২৪তম বিসিএস]
- বিদ্যা যতই বাড়ে ততই জানা গেল যে, কিছুই জানা হলো না। [২৩তম বিসিএস]
- স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
  ক্ষণকালের ছন্দ
  উড়ে দিয়ে ফুরিয়ে গেল
  সেই তার আনন্দ। [২২তম বিসিএস]

ভাব-সম্প্রসারণ

- বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। [২২তম বিসিএস]
- লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু [২১তম বিসিএস]
- মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়
  আড়ালে তার সূর্য হাসে,
  হারা শরীর হারা হাসি
  অন্ধকারেই ফিরে আসে। [২১তম বিসিএস]
- যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপিরিমিত [২০তম বিসিএস]
- অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে; তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে। [২০তম বিসিএস]
- সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
  ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি। [১৮তম বিসিএস]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম
অথবা,
ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ

[৩৮তম বিসিএস]

ভূমিকা:

"মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি,
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি ...।" -গোবিন্দ হালদার

গত একশ বছরের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ। পরাধীন জাতির স্বপ্ন-সাধ ও মর্যাদা বলতে কোনো কিছু থাকে না। এজন্য কোনো জাতিই পরাধীন থাকতে চায় না। পরাধীন জাতি শোষিত ও বঞ্চিত হতে হতে এক সময় তার মধ্যে জন্ম নেয় সংগ্রামী চেতনার। আর এ সংগ্রামী চেতনাই মানুষের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ হিসেবে স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা বাঙালি, বাংলাদেশের অধিবাসী। কিন্তু এ দেশ একসময় পরাধীন ছিল। আমরা ছিলাম পরাধীন দেশের নাগরিক। সুদীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী এক স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। আজ আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের নাগরিক। বিশ্ব দরবারে আমরা বীর বাঙালি হিসেবে পরিচিত। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

তবে আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস বেদনার ইতিহাস হলেও তা গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় ভাস্বর। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে নানা ঘটনা-উপঘটনা বাংলাদেশকে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনাগুলোই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির নিয়ামক।

পূর্ব ইতিহাস: ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের আগে পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান-প্রধান অঞ্চল নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রস্তাব আনা হয়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী যুক্তবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব দিলেও ঔপনিবেশিক শাসকেরা তা নাকচ করে দেয়। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি পূর্ব ভারতে আলাদা সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রস্তাব করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বহু রাজনৈতিক আলোচনার পর ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে, ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের পূর্বে, হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং বাংলার পূর্ব অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারত প্রজাতন্ত্র দ্বারা বিভক্ত নবগঠিত পাকিস্তান অধিরাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম দুইটি অংশের ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল দুই হাজার মাইলের অধিক। দুই অংশের মানুষের মধ্যে কেবল ধর্মে মিল থাকলেও, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে প্রচুর অমিল ছিল। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ অনানুষ্ঠানিকভাবে (পরে আনুষ্ঠানিকভাবে) 'পশ্চিম পাকিস্তান' এবং পূর্ব অংশ প্রথম দিকে 'পূর্ব বাংলা' ও পরবর্তীতে 'পূর্ব পাকিস্তান' হিসেবে অভিহিত হতে থাকে। পাকিস্তানের দুই অংশের জনসংখ্যা প্রায় সমান হওয়া সত্ত্বেও, রাজনৈতিক ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মাতে থাকে যে, অর্থনৈতিকভাবে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ রকম বিভিন্ন কারণে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে।

প্রবন্ধ-রচনা

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ:

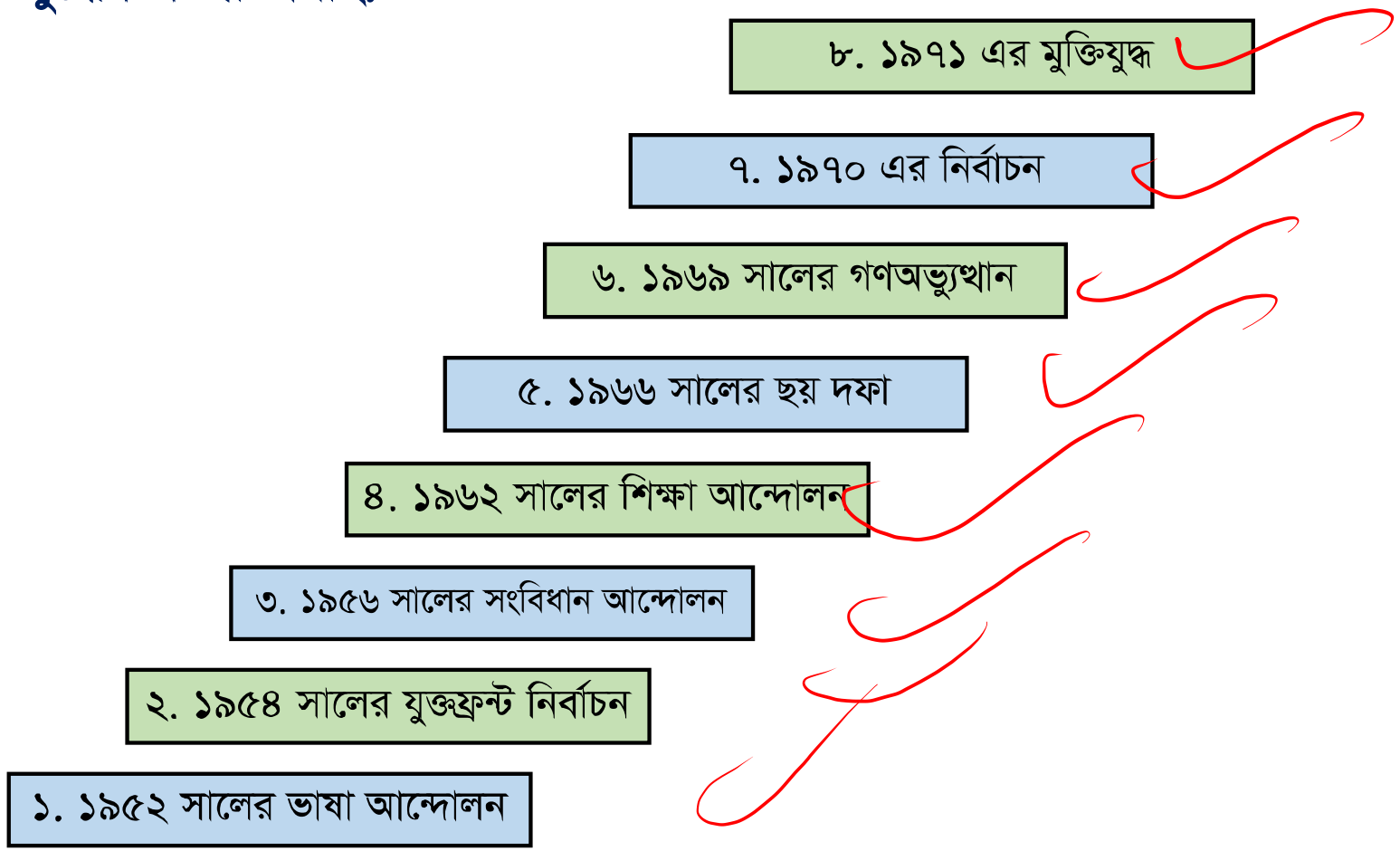

প্রবন্ধ-রচনা

ভাষা আন্দোলন: ভাষা আন্দোলন ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রথম প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মসূচি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে আসছিল। পাকিস্তান সরকার এ যৌক্তিক দাবির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে ১৯৪৮ সালেই উর্দুকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ চলতে থাকে যা পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। এ আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় ১৯৫২ সালে এবং সেই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্ররা একত্রিত হয়। পুলিশ এ জনসমাবেশের উপর গুলি চালানোর ফলে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে শহিদ হয়। এই ঘটনা আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দান করে এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব বহুমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। ১৯৫৬ সালে চূড়ান্তভাবে সংবিধানে বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি অন্যতম প্রধান জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

'৫২-এর ভাষা আন্দোলন ছিল একটি সর্বস্তরের ব্যাপক আন্দোলন। এ আন্দোলন পরবর্তী সকল আন্দোলনের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার বাতিঘর। এটি ছিল একই সাথে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ চেতনার উন্মেষ, স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের উপাদান হিসেবে ভূমিকা রাখে এ ভাষা আন্দোলন। কবির ভাষায় –

"মোদের ভাষার প্রাণ
একুশ করেছে দান
একুশ মোদের পাথেয়
একুশকে করো নাকো হেয়।"

– আব্দুল গাফফার চৌধুরী

প্রবন্ধ-রচনা

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট সাধারণ নির্বাচন ও ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন: ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচন ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলত এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও তার দোসরদের শোষণের বিরুদ্ধে এক 'ব্যালট বিপ্লব'। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর তা আরও জোরদার হয়। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম বামপন্থী গণতন্ত্রী দল এবং পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। পূর্ব বাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফাভিত্তিক নির্বাচনি ইশতেহার প্রণয়ন করে। এই ২১ দফার প্রথম দফা ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা।

নির্বাচনের ফলাফল: ১৯৫৪ সালে ১০ মার্চ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গের আইন পরিষদে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। এতে যুক্তফ্রন্ট পায় ২৩৬ = (২২৩+১৩)। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭ আসনে যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৩টি এবং অমুসলিমদের সংরক্ষিত ৭২ আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ১৩টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাঙালির এই আধিপত্য মেনে নিতে পারেনি। মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। পরবর্তী সময়ে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের কৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি করে। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়।

১৯৬২ সালের শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন: আইয়ুব খান ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এস. এম. শরীফকে চেয়ারম্যান করে 'শরীফ শিক্ষা কমিশন' নামে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের পেশকৃত রিপোর্টে বলা হয়– "শিক্ষা এমন কোনো জিনিস নয় যা বিনামূল্যে পাওয়া যেতে পারে।" আইয়ুব খান ১৯৬২ সাল থেকে এই রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়ন শুরু করলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ সরকার বিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ১৪৪ ধারার মধ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়।
এ দিন ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। পুলিশের বাধার মুখেও ছাত্রদের মিছিল এগিয়ে গেলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে মোস্তফা ও বাবুল নামে দুজন ঘটনাস্থলে নিহত হয় এবং পরদিন গুলিবিদ্ধ ওয়াজিউল্লাহ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে। ছাত্র আন্দোলনের মুখে সরকার শেষ পর্যন্ত শরীফ কমিশন রিপোর্টের বাস্তবায়ন স্থগিত ঘোষণা করে।

'৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন:

'সাঁকো দিলাম স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য।'

-জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। বাংলাদেশের জন্য এই আন্দোলন এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে একে ম্যাগনাকার্টা বা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদও বলা হয়। মূলত ৬ দফাই ছিল ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মূল ভিত্তি।

প্রবন্ধ-রচনা

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়কালে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত ছিল। স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের ধারাবাহিকতায় পূর্ববাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ন্যূনতম উন্নতি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। বাঙালিদের প্রতি জাতিগত এই বৈষম্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে আহুত 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলন' এ শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি উপস্থাপন করেন। ভাষণে তিনি বলেন, "গত দুই যুগ ধরে পূর্ব বাংলাকে যেভাবে শোষণ করা হয়েছে তার প্রতিকারকল্পে এবং পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক দূরত্বের কথা বিবেচনা করে আমি ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করছি।" দাবিগুলোর মধ্যে ছিল –

প্রথম দফা	প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন; ফেডারেল রাষ্ট্র।
দ্বিতীয় দফা	কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।
তৃতীয় দফা	পৃথক ও সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা, আলাদা কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
চতুর্থ দফা	কর ধার্য ও শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা।
পঞ্চম দফা	বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা, আমদানি ও রপ্তানির পৃথক পৃথক হিসাব।
ষষ্ঠ দফা	প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন।

ছয় দফার দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ফার্মগেট এলাকায় বিক্ষোভ আন্দোলন চলে। এতে পুলিশের গুলিতে শ্রমিক নেতা মনু মিয়া সহ ১১ জন নিহত হন। ফলে আন্দোলন আরো বেগবান হয়।

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান:

"১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান শুধুমাত্র আইয়ুব খানেরই পতন ঘটায়নি, এটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অনবদ্য ভূমিকা রেখেছিল।"

-ড. রেহমান সোবহান

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ছাত্রসমাজের ১১ দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন, জরুরি আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে ছাত্র-জনতার আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ছাত্রসমাজের ১১ দফা এবং জনতার ছয় দফা দাবিকে রাষ্ট্রবিরোধী দাবি বলে ঘোষণা করে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা সাজিয়ে অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। এর ফলে সমগ্র বাংলাদেশের ছাত্রজনতা আন্দোলনে রুদ্ররোষে ফেটে পড়ে এবং ধীরে ধীরে এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এ আন্দোলনের ফলে ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি আসাদুজ্জামান আসাদ, ২৪ জানুয়ারি মতিউর রহমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুজ্জোহাকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে।

ফলাফল:

- ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান।
- স্বৈরাচারী আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

'৭০ এর সাধারণ নির্বাচন:

"১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের মৃত্যুর বার্তাবাহক এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঊষালগ্ন।"

-আবুল মাল আবদুল মুহিত

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ সৃষ্টির পিছনে যেসব ঘটনাপ্রবাহ বিশেষ স্থান দখল করে আছে, ১৯৭০ এর নির্বাচন সেগুলোর অন্যতম। '৬৯-এর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের ফলাফল-

জাতীয় পরিষদ নির্বাচন		প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন (পূর্ব পাকিস্তান)	
দল	আসন সংখ্যা	দল	আসন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	১৬৭	আওয়ামী লীগ	২৯৮
পাকিস্তান পিপল'স পার্টি (পিপিপি)	৮৮	পাকিস্তান পিপল'স পার্টি (পিপিপি)	২
অন্যান্য	৫৮	অন্যান্য	১০
মোট	৩১৩	মোট	৩১০

কিন্তু পাকিস্তান সরকার নির্বাচনের এ ফলাফল শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে। এমতাবস্থায় সর্বস্তরের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
মূলত এ নির্বাচনের মাধ্যমেই ঘোষিত হয় পাকিস্তানের মৃত্যুবার্তা। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদি ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করত, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস হয়তো অন্যরূপে আবর্তিত হতো। বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্যবাদ দাবি করে আসছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির সেই স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় ঘটে। নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুক্তিকামী জনতার চেতনা আরো বেশি বৃদ্ধি পায়, যা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ মার্চের ভাষণ: নির্বাচনে জয়লাভের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনে মত দিতে অস্বীকার করেন। একটি রাজনৈতিক দল জনগণের ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের ম্যান্ডেট পেয়েছে। তারা সরকার গঠন করবে, এটাই ছিল বাস্তবতা। কিন্তু সামরিক শাসকগণ সরকার গঠন বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে এক আলোচনা শুরু করে। কিসের জন্য আলোচনা, এটা বুঝতে বাঙালি নেতৃবৃন্দের খুব একটা সময় লাগেনি। জাতীয় সংসদের নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ১ মার্চ, ১৯৭১ দেশব্যাপী অসহযোগের আন্দোলনের আহ্বান জানান। সর্বস্তরের জনগণ এক বাক্যে বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অচল করে তোলে। অসহযোগ আন্দোলন ২ মার্চ শুরু হয়ে ২৫ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

ইতোমধ্যে ৭ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক দিকনির্দেশনী ভাষণে সর্বপ্রকার পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান। এই নির্দেশ দেশের সর্বস্তরের ছাত্র, জনতা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে বাঙালি সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলকেই সচেতন করে তোলে। তাই তো জনগণ দলমত নির্বিশেষে সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। "মূলত ৭ মার্চের ভাষণই ছিলো মুক্তিযুদ্ধের পরোক্ষ ঘোষণা।"

অপারেশন সার্চলাইট ও ২৫ মার্চের গণহত্যা: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কাল রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশে বাঙালি নিধন তথা নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। তাদের পূর্বপরিকল্পিত এই গণহত্যাটি 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিচিত। এ গণহত্যার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগে থেকেই পাকিস্তান আর্মিতে কর্মরত সকল বাঙালি অফিসারদের হত্যা কিংবা গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হয়। ঢাকার পিলখানায়, ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের সামরিক আধাসামরিক সৈন্যদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ২৫ মার্চ রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ধারণা করা হয়, সেই রাত্রিতে একমাত্র ঢাকা ও তার আশেপাশের এলাকাতে প্রায় এক লক্ষ নিরীহ নর-নারীর জীবনাবসান ঘটে। এক পর্যায়ে ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্বাধীনতার ঘোষণা: ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞে সারা বাংলাদেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এমতাবস্থায় গ্রেফতারের আগ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তা ওয়ারলেসের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ. হান্নান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে পাঠ করলে সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এরপর ২৭ মার্চ একই বেতার কেন্দ্র থেকে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান আবারও ঘোষণাপত্র পাঠ করলে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর এভাবেই সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম গড়ে ওঠে।

অস্থায়ী সরকার গঠন: ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠা হয় কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমা (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলার অন্তর্গত ভবেরপাড়া (বর্তমান মুজিবনগর) গ্রামে। শেখ মুজিবুর রহমান এর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠন করা হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পিত হয় তাজউদ্দিন আহমদের উপর। বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সামনে শপথ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পালন শুরু করে। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের মাধ্যমে ২৬ মার্চ হতে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

মুক্তিবাহিনী গঠন ও যুদ্ধের প্রস্তুতি: পাক হানাদার বাহিনীর জ্বালাও-পোড়াও, অত্যাচার-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে জীবন বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্য থেকে কর্নেল (অবঃ) মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী একটি বিরাট গেরিলা বাহিনী ও নৌ-কমান্ডো বাহিনী গঠন করেন। এর পাশাপাশি তিনি বিমান বাহিনী গঠন করেন। বিমান বাহিনী তাদের নিজস্ব বিমান নিয়েই ৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম ও ঢাকায় প্রথম বিমান হামলা চালায়। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক সেক্টরে একজন কমান্ডার নিযুক্ত করেন। এ কমান্ডারদের অধীনে মুক্তিবাহিনী হানাদারদের বিরুদ্ধে ইস্পাত কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যতই দিন যেতে থাকে ততই সুসংগঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধরীতি অবলম্বন করে শত্রুদের বিপর্যস্ত করে। বিশাল শত্রুবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ নিয়েও মুক্তিবাহিনীর মোকাবিলায় সক্ষম হচ্ছিল না।

মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণ: ১৯৭১ সালের নভেম্বরের শেষদিকে মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৪ ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী যৌথভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ৬ ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ৪ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশে পাকবাহিনীর সবগুলো বিমান দখল করে নেয়। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণে ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয়।

পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও চূড়ান্ত বিজয়:

"নিয়াজি রিভলবারের সাথে পূর্ব পাকিস্তানকেও এদের হাতে তুলে দিল।"

-সিদ্দিক সালিক

১৪ ডিসেম্বর যৌথবাহিনী ঢাকার মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি হাজার হাজার উৎফুল্ল জনতার সামনে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। প্রায় ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে, যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত বিজয় ধরা দেয় যুদ্ধ শুরুর নয় মাস পর। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের।

উপসংহার:

"স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজর কবিতা অবিনাশী গান
স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।"

– শামসুর রাহমান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে মিশে আছে এদেশের ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী তথা আপামর জনতার রক্তিম স্মৃতি। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তির যে সনদ রচিত হয়েছিল, স্বাধীনতাযুদ্ধে হানাদার পাকবাহিনীকে পরাজিত করে সে সনদের যথার্থ মান রক্ষিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে বীর বাঙালি বর্বর পাকবাহিনীর কাছ থেকে স্বাধীনতার সেই রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল; স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বের মানচিত্রে তৈরি হয় লাল-সবুজের পতাকা এবং আমরা পরিচিত হই বাঙালি হিসেবে। এ অর্জন বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেয়। তাই এ অর্জন ধরে রাখার পাশাপাশি আমাদের সবার মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের মতো দেশাত্মবোধে জেগে উঠতে হবে- তবেই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত সার্থকতা প্রতিফলিত হবে।

প্রবন্ধ-রচনা

- জাতীয় উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম/ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ।
- সুশাসন: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত/আইনের শাসন ও বাংলাদেশ।
- গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ/বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা: সমস্যা ও সম্ভাবনা।
- মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
  মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।
- বাঙালির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি।
- স্বদেশপ্রেম/দেশাত্মবোধ।
- সম্প্রদায়কি সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ।
- বিশ্বায়ন ও আমাদের সংস্কৃতি/সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।
- কর্মমুখী শিক্ষা/বৃত্তিমূলক শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা।

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়